জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা, মার্কিন কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও সফটওয়্যার ডেভেলপার মার্ক জুকেরবার্গের জন্ম ১৯৮৪ সালে।

পশ্চিম ভারতে হিন্দু জাগরনের অন্যতম উদ্যোক্তা, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি এনজি চন্দাভারকারের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শুক্রবার, ৩০ বৈশাখ ১৪২৮
■ ৪১ বর্ষ ■ ৩৫৩ সংখ্যা

অসাম্যের অভিশাপ

মহামারিতে ধ্বস্ত সমাজকে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি পরিচালিত সরকার যে ব্যর্থ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। করোনা নিয়ন্ত্রণে সরকারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব প্রকাশ্যে দৃশ্যমান। এটাও পরীক্ষিত সত্য যে, সংক্রমণ যে গতিতে ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, তাকে কড়া হাতে লাগাম না পরানো হলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর মানুষের যেটুকু ভরসা অবশিষ্ট আছে, তা মাটিতে মিশে যাবে। করোনা শুধু মানুষের মধ্যে আতঙ্কের বীজ রোপণ করেনি, এই ভয়াল সংক্রমণ আরেকটি দুর্ভাগ্য রচনা করেছে। মহামারি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ত্রুটিপূর্ণ এবং হঠকারী পরিচালনার কারণে অসাম্যের চারাগাছটি ক্রমে মহীরুহ হয়ে উঠছে।

মহামারিকালে দেশে বিভিন্ন সামাজিকস্তরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হচ্ছে, যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেশে যখন একদিকে টিকা, অক্সিজেনের আকাল, প্রয়োজনীয় ওষুধ সাধারণের নাগালের বাইরে, তখন প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন শহরাঞ্চলে করোনা সংক্রমণ এবং তজ্জনিত কারণে মৃত্যুর খবর সামনে আসছে। সমস্ত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না করতে পারায় সরকারকে আংশিক সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। কারণ, এইসব শহরাঞ্চলে সংবাদমাধ্যমের তীক্ষ্ণ নজর থাকে। প্রতি মুহূর্তে এইসব এলাকায় মিডিয়ার আলো থাকায় সরকারের পক্ষে চোখ বন্ধ করে সমস্যা এড়িয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যেখানে মিডিয়ার আলো পড়ে না, সেই অনালোকিত, বরাবরের অবহেলিত অঞ্চলগুলি আরও অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যাঁরা ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা পেলে নিজেদের ধন্য মনে করেন, তাঁরা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়েই আছেন। এই দুর্দিনে প্রান্তিক মানুষ মর্মান্তিক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। একে দেশের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যথেষ্ট দুর্বল, তার ওপর মহামারির কবলে তা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে মহামারির প্রভাব সম্পর্কে সরকারের কাছে কোনও নির্দিষ্ট তথ্যও নেই। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হলে প্রকৃত পরিসংখ্যান সরকারের হাতে আসার সম্ভাবনা থাকত। সেই কাজ কেন্দ্র করেনি বা রাজ্য সরকারগুলিকে সেই কাজ করতে নির্দেশিকা দেয়নি।

মোদি সরকার দিল্লির মসনদে আসীন হওয়ার পর থেকে দেশকে প্রযুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে আসছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেনি। এখনও দেশের জনসংখ্যার মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ ইন্টারনেটের সুবিধা পায়। অনেকের হাতে মোবাইল থাকলেও তাতে ইন্টারনেট সংযোগ নেই। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যের বহু এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবাই নেই। সরকারের নির্দেশে করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পাওয়ার কথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণের জন্য সরকার নির্ধারিত অ্যাপে নাম, ঠিকানা লিপিবদ্ধ করানোর কথা। অর্থাৎ সরকার ধরেই নিয়েছে যে, দেশে সমস্ত মানুষের কাছে ইন্টারনেট আছে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এমন নিয়মবিধি প্রণয়নের কোনও বাস্তব ভিত্তিই নেই।

গ্রামের প্রচুর মানুষ নিজের নাম, ঠিকানা কোউইন অ্যাপে লিপিবদ্ধ না করাতে পারায় চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না। আবার করোনা সংক্রান্ত তথ্যও সরকারের কাছে আসছে না। প্রত্যন্ত জনপদে দরিদ্রদের চিকিৎসায় অবহেলার পিছনে তথ্যের অপ্রতুলতা বড় কারণ। গ্রামাঞ্চলে কোভিড পরীক্ষার ব্যবস্থাই কার্যত নেই। পরীক্ষা না হওয়ায় সংক্রমণের তীব্রতা সম্পর্কে সরকার অন্ধকারে। অপ্রতুল গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং তথ্যের অভাব, এই দুইয়ের অভাবে ধুঁকছে গ্রামাঞ্চল। গ্রাম এবং শহরের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই অসাম্য বৃদ্ধি দেশ এবং জাতির কাছে অশুভ বার্তা নিয়ে আসবে। সভ্যতার রথও বিপরীত পথে হাঁটবে। অতএব, আত্মপক্ষ সমর্থনের দামামা না বাজিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন হয়ে আত্মবিশ্লেষণে ব্রতী হওয়া।

অমৃতধারা

প্রকৃতির অনুকূলে চললে যে জীব তিন জন্মে মুক্ত হত, সেই জীব নিজকর্ম দ্বারা একজন্মেই তার বাঁধন ছিঁড়তে পারে। আবার যার এক জন্মে মুক্ত হবার সম্ভাবনা, কর্মফলে তার সাত জন্মও লাগাতে পারে। এই জন্য কর্মকে বিধির চেয়েও বড়ো বলে। ব্রহ্মচর্য সাঁতার শেখা, গার্হস্থ্য সাঁতার দেওয়া, ব্রহ্মচর্য যুদ্ধ শেখা আর গার্হস্থ্য যুদ্ধ করা। গার্হস্থ্যে শুধু ব্রহ্মচর্যের বিধি নিয়ে থাকলে হবে না – কর্ম করা চাই। ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয় প্রাপ্তির নাম সুখ, আর তার বিপরীতই দুঃখ। সাংসারিক সুখ বিষয় সাপেক্ষ। বিষয় অনিত্য, সুতরাং সুখও অনিত্য। তুমিই সুখ স্বরূপ, এই অনুভূতিতে। আত্মবিকাশেই সুখস্বরূপের উপলব্ধি হয়। কখনো অকারণ আনন্দে মন উছলে উঠে, ওই হচ্ছে আত্ম আনন্দের আভাস।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

শব্দরঙ্গ ■ ২৯১৬

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। বাচনিক, মৌলিক ৩। বন্ধু, সখা ৫। কোকিল ৬। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ৮। বেজি, পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ১০। শিথিল, আলগা ১২। দশ ফোঁটার তাস ১৪। পথ, উপায় ১৫। তালিকা, ফিরিস্তি, ফালি বা টুকরো ১৬। রঞ্জিত, রংযুক্ত, নানা রংয়ে শোভিত।
উপর–নীচ : ১। প্রিয় বৎস, স্নেহের পাত্রকে সম্বোধনবিশেষ ২। চাতক পাখি ৪। তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত, নৈয়ায়িক, তর্কপ্রিয় ৭। চিঠি, লিখন, অক্ষর, বর্ণমালা ৯। খারিজ, রহিত, দাঁত ১০। ফল খাওয়া, ফলার ১১। প্রখ্যাত মুনিবিশেষ, পাণিনি–ব্যাকরণের বার্তিক প্রণেতা ১৩। সত্য বলার জন্য শপথ বা ঈশ্বরের নামে দিব্যি।

সমাধান ■ ২৯১৫

পাশাপাশি : ১। পূতিকা ৩। জহরত ৪। জটলা ৫। ধিনিকেষ্ট ৭। মাঘ ১০। নর ১২। কাকাতুয়া ১৪। জামির ১৫। মলমল ১৬। রাতুল।
উপর–নীচ : ১। পূর্ণোপমা ২। কাজরি ৩। জলাধিপ ৬। কেতন ৮। ঘন্টিকা ৯। মায়াজাল ১১। রসাতল ১৩। হররা।

করোনার প্রতিরোধে দায়বদ্ধতা নেই কেন্দ্র ও বহু রাজ্য সরকারের

অশোক ভট্টাচার্য

ঠিক এক বছর আগে করোনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমার লেখা অনেকগুলি নিবন্ধের সংকলন একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে একটি লেখায় দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম, যত বেশি উন্নত দেশ, বিশেষ করে যে সমস্ত দেশে নগরায়ণের হার বেশি, সেই সমস্ত দেশের শহর এলাকার বেশি সংখ্যায় মানুষ করোনা রোগে সংক্রামিত হচ্ছে। মৃত্যুর হারও এখানে বেশি। তুলনায় কম উন্নত দেশগুলিতে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা যেমন কম, মৃত্যুর হারও কম।

বর্তমানে আমার অনুমান সঠিক ছিল না বলেই মনে হয়। ভারতে যেভাবে করোনা সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে, তাতে ভারত অচিরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধরে ফেলতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত। তাছাড়া এই সমস্ত দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশের থেকে অনেক দুর্বল। আমার বইটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন সারা বিশ্বের মোট করোনা সংক্রামিত মানুষের মধ্যে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অংশ ছিল ০.৯৯%। অথচ ২০২০ সালের অগাস্টে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল সারা বিশ্বের ১৩.১৭%। সেই সময়ে করোনা সংক্রামিত মানুষের ২৬.৩৮ শতাংশই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলির অংশ ছিল ৭.৯২ শতাংশ। এই চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে করোনার ব্যাপ্তির কী দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হচ্ছে এবং তা দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে।

ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দুর্বলতার ফলে করোনার নেতিবাচক প্রভাব এই সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়েছে, যা সামলানো এই সমস্ত দেশের পক্ষে কঠিন। ভারতে যেভাবে করোনা সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা বা মৃত্যু বাড়ছে, তাতে ২০২১ সালের কোভিড হটস্পট ভারত বা দক্ষিণ এশিয়া। ২০২০ সালে করোনার হটস্পট ছিল আমেরিকা বা ইউরোপের দেশগুলি।

উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে করোনা বা যে কোনও স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়া, উন্নয়নশীল বা গরিব দেশগুলির থেকে কিছুটা হলেও তুলনায় সহজ। কারণ উন্নত দেশগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নশীল দেশগুলির থেকে অনেকটা উন্নত। এই সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট গার্হস্থ্য উৎপাদনে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে অনেক বেশি। স্বাস্থ্যখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি বলে উন্নত দেশগুলির চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাথাপিছু নিজস্ব অর্থব্যয় অনেক কম।

প্রথম ঢেউয়ের পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থা অনেক উন্নত দেশের তুলনায় এতটা ভয়াবহ ছিল না। তাহলে দ্বিতীয় ঢেউয়ের পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হল কেন?

একথা আমাদের সকলেরই জানা, ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম দুর্বলতম ব্যবস্থা। দশকের পর দশক ধরে ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট গার্হস্থ্য উৎপাদন বা জিডিপির মাত্র ১ শতাংশ। বহুবার দাবি ওঠার পরও তা বৃদ্ধি করে ২ শতাংশও করা হয়নি। অথচ চিনে এক দশক আগেই এই হার ছিল ২.৯ শতাংশ। এমনকি ভুটানে এই হার ২.৪ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ২.৯ শতাংশ, ফ্রান্সে ৮.৭ শতাংশ, ইতালিতে ৬.৫ শতাংশ, ইংল্যান্ডে ৭.৬ শতাংশ। প্রতি ১০০০ জনে শয্যার সংখ্যা ভারতে ০.৫, শ্রীলঙ্কায় ৩.৬, চিনে ৪.২, ফ্রান্সে ৫.৯, ইতালিতে ৩.২।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতে প্রতি একজন দেশবাসীকে গড়ে ৬২.৫ শতাংশ খরচ পকেট থেকেই দিতে হয়। চিনে এই হার অনেক কম, সেখানে ব্যয় করতে হয় ৩৬.২ শতাংশ। দক্ষিণ কোরিয়াতে ৩৩.৭ শতাংশ, ফ্রান্সে ৯.৪ শতাংশ, ইংল্যান্ডে ১৬.০ শতাংশ। প্রতি ১০০০ জনে করোনা রোগের নমুনা পরীক্ষা হয়ে থাকে ভারতে ১৪.৪ জনের, চিনে ৬২.৮ জনের, ফ্রান্সে ৪৫.৬ জনের, ইতালিতে ১১৪.৪ জনের, ইংল্যান্ডে ২৩৯.৭ জনের।

> **প্রধানমন্ত্রী ভারতে প্রস্তুত করোনা টিকা ৯০টি দেশে রপ্তানি করে বাইরের কিছু দেশের প্রশংসা অর্জন করে খুশিতে গদগদ হতে পারেন, কিন্তু সারা বিশ্বের টিকাকরণে অন্যতম ব্যর্থ দেশের নাম আজ ভারত। টিকাকরণে ভারতের স্থান বিশ্বে সর্বনিম্নে।**

ভারত সহ কয়েকটি দেশের সন্তোষজনকভাবে সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থার আওতায় আসা জনসংখ্যার হারে তাকালে দেখব ভারতের সূচক ৪৭, এমনকি ভুটান ও বাংলাদেশের সেই সূচক যথাক্রমে ৫১ ও ৫৪, চিনে ৭০, কিউবা ৭৩, জার্মানি ৮৬, ফ্রান্স ৯১ ইত্যাদি। এই কয়েকটি তথ্যই প্রমাণ করে ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রকৃত হালটি কী।

পঞ্চদশ জাতীয় অর্থ কমিশনের কাছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য চেয়েছিল ৫.৭৪ লক্ষ কোটি টাকা। ৫.১৩ লক্ষ কোটি টাকাই ছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন অনুমোদন করেছে কত? মাত্র ১.০৬ লক্ষ কোটি টাকা, যা ৫ বছরের জন্য জিডিপির মাত্র ০.১ শতাংশ।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আবার সব রাজ্যে এক নয়। ৭০ শতাংশ রাজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। মন্দের ভালো কেরল, দিল্লি, তামিলনাড়ু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি ১০০০ জনে অন্তত ১জন চিকিৎসক থাকা প্রয়োজন, ভারতে রয়েছে ০.৮ জন, চিনে ১.৮ জন। ভারতে প্রতি ১ লক্ষ জনে রয়েছে ৭ জন শল্য চিকিৎসক, চিনে ৮০ জন। ভারতে শুধুমাত্র চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে শহর ও গ্রামের বহু মানুষের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে আসছে। সম্প্রতি ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে সংস্থার সমীক্ষা থেকে দেখা ৬৩.২২ মিলিয়ন মানুষ বা ১১.৮৮ মিলিয়ন পরিবার নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গিয়েছে কেবলমাত্র চিকিৎসার অতিরিক্ত ব্যয় নিজের পকেট থেকে নির্বাহ করতে গিয়ে। এর ফলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৬.৬ শতাংশ ও শহর এলাকায় ৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে গিয়েছে।

ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই চেহারা নিয়ে শুধু করোনার মতো মহামারিই নয়, যে কোনও সংক্রামক রোগ বা মহামারি প্রতিরোধও কঠিন। শুধু তাই নয়, জনসচেতন করা বা রোগ প্রতিরোধের প্রস্তুতির মধ্যেও দেশের কেন্দ্রীয় বা বহু রাজ্য সরকারের নেই কোনও দায়বদ্ধতা বা রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং পরিকল্পনা। এই প্রস্তুতি, পরিকল্পনা বা অগ্রাধিকারের চরম ব্যর্থতার কারণে পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা, আইসিইউ শয্যা, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থার চরম অভাবের বিষয় তো ছেড়েই দিচ্ছি, নেই সাধারণ ওষুধ, নেই অক্সিজেন, নেই অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। দুঃখের কথা, মারা যাওয়ার পর মৃতদেহ দাহ বা সৎকার করার ব্যবস্থাও নেই। প্রধানমন্ত্রী ভারতে প্রস্তুত করোনা টিকা ৯০টি দেশে রপ্তানি করে বাইরের কিছু দেশের প্রশংসা অর্জন করে খুশিতে গদগদ হতে পারেন, কিন্তু সারা বিশ্বের টিকাকরণে অন্যতম ব্যর্থ দেশের নাম আজ ভারত। টিকাকরণে ভারতের স্থান সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্নে। অথচ করোনা মহামারির প্রথম পর্যায়ের পর প্রায় এক বছর সময় পেয়েছিল দেশের সরকার বা বিভিন্ন রাজ্যের সরকার। বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্ন রাজ্যকেও তারা প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশও দেয়নি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলা দখলই বড় হয়ে গেল, করোনা প্রতিরোধ থেকে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি দায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির প্রস্তুতিহীনতা।

এমনিতেই ভারতে রাষ্ট্রীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার নড়বড়ে চেহারা, তার ওপর প্রস্তুতি, দায়বদ্ধতা, সদিচ্ছার অভাব, এই রোগ প্রতিরোধে চরম ব্যর্থতার পরিণতিতেই দেশের আজকের এই বিপর্যয়কর অবস্থা। সামনের দিনগুলি হয়তো বা অপেক্ষা করছে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্যে।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী এবং শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র)

আলোচিত

মোদি–শার তৈরি চিত্রনাট্য অনুযায়ী কাজ করছেন বাংলার রাজ্যপাল। মোদি বা শা নির্বাচনে বিশ্রীভাবে হেরে সংবিধানের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন না। মমতাকে ওঁরা কখনও শান্তিতে থাকতে দেবেন না।

–যশবন্ত সিনহা

আজ

১৯৩৯ সালে এদিনই পেরুর টিক্রাপো শহরের পাঁচ বছর বয়সি লিনা মেদিনা পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ মা হওয়ার রেকর্ড গড়েন। লিনার ডাক্তার জেরার্ডোর নামাঙ্কিত সন্তান ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

বিন্দু বিসর্গ

হাত দেখে একটু বলুন না, সেকেন্ড ডোজ কবে পাবো?

ইদ মানে সবসময় সম্প্রীতির এক নিটোল ছবি

কাজী কামাল নাসের

আমার এই একষট্টি উত্তীর্ণ বয়সে ইদের আলাদা কোনও তাৎপর্য অনুভব করি না। অন্য যে কোনও উৎসবের ক্ষেত্রেই এটা একইভাবে প্রযোজ্য। এখন বরং ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যখন ইদ উপলক্ষ্যে নতুন জামাকাপড়ে সেজে হইহই আনন্দে মেতে ওঠে, সেই ছবিটা দূর থেকে দেখতেই বেশি ভালো লাগে। তবে গত বছর থেকে করোনা যেভাবে আমাদের জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে, তাতে জীবন সম্পর্কে আশৈশবলালিত সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিটাই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। এতদিন আমার কাছে জীবন ছিল উৎসব। আর এখন জীবন মানে জানলার গ্রিলে চোখ রেখে দূরে নিঃসীম শূন্যের দিকে একা একা তাকিয়ে থাকা আর মনে মনে সেই অমোঘ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফেরা। আজ আছি, কাল থাকব তো?

মনের গহীনে ডুব দিয়ে দেখলাম, জীবনে ইদের যা কিছু সুরভিত স্মৃতি–সবই শৈশবের। আমার ছেলেবেলা কেটেছে খিদিরপুরের একবালপুরে। ধর্মের নিরিখে মুসলিমদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল এবং পুরো এলাকাটাই ছিল অবাঙালি অধ্যুষিত। তখন ইদ হত শীতকালে। আসলে চান্দ্রমাসের হিসেবে ইদের দিন ধার্য হয় বলেই সময়ের এমন আগুপিছু ঘটে থাকে। রমজান মাস শুরু হয়ে গেলেই ইদের কেনাকাটা করতে কবে যাওয়া যায়, তাই নিয়ে মা–বাবার আলোচনা শুরু হয়ে যেত। তারপর একদিন সপরিবার আমরা যেতাম ধর্মতলার বিধান মার্কেট অথবা নিউ মার্কেটে।

ইদের নতুন জামা–জুতো কেনার পর থেকেই শুরু

হয়ে যেত কাউন্টডাউন। কবে ওই নতুন পোশাকে সেজে এদিক–সেদিক ঘুরতে যাব! আর নতুন জুতো মাথার কাছে নিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার সেই বহুচর্চিত গল্প আমার জীবনেও ছিল বৈকি! ইদের চাঁদ দেখতে পাওয়ার উপরেই নির্ভর করে রমজান পুরো তিরিশ দিনই হবে, নাকি উনত্রিশ দিনেই শেষ হয়ে যাবে। তখন এত গণমাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমের রমরমা ছিল না। চাঁদ দেখা গেল কি না জানতে আকাশবাণীর বেতার তরঙ্গে দিল্লির সন্ধে সাড়ে সাতটার বাংলা খবর, কলকাতা কেন্দ্রের স্থানীয় সংবাদের জন্য অপেক্ষা করতে হত। তবে অঞ্চলের অত্যুৎসাহী মানুষজন বিকেল থেকেই আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন নিজের চর্মচক্ষে ইদের চাঁদ প্রত্যক্ষ করবেন বলে।

চাঁদ দেখতে পেলেই পাড়ায় বাজি–পটকা ফাটানো শুরু হয়ে যেত। যদিও পরের দিন উৎসব পালিত হচ্ছে কি না, দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম এবং কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের বার্তা শোনার পরেই তাতে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর পড়ত।

ইদের আগের রাতকে বলা হয় চাঁদ রাত। এই উপলক্ষ্যে মুসলিম এলাকার সমস্ত বাজার–হাট সারারাত খোলা থাকে। যাঁদের কেনাকাটা তখনও শেষ হয়নি, তাঁরা সেই রাতেই বাকি কেনাকাটা সেরে ফেলেন। এছাড়া মাংস ও সেমাইয়ের দোকানেও লম্বা লাইন পড়ে। বাবা সবকিছু সরঞ্জাম কিনে এনে দিতেন আর মাকে দেখতাম টানা একমাস রোজা রাখার সব কষ্ট উপেক্ষা করে সারারাত ধরে লাচ্চা পরোটা, সেমাই, মাংস ইত্যাদি রান্না করতেন। কারণ সকাল হলে ইদের নমাজ পড়ে ঘরে ফিরলেই পাড়া–প্রতিবেশী, অতিথি অভ্যাগতরাও আসতে শুরু করে দেবেন।

ইদের দিন প্রবল শীতে অত ভোরে স্নান করাটা খুব শাস্তি মনে হত। তারপর অবশ্য নতুন আদ্দির পাজামা–পাঞ্জাবি পরে, মাথায় টুপি দিয়ে, আতর মাখানো এক টুকরো তুলো কানে গুঁজে বাবার সঙ্গে পাড়ার নিকটবর্তী মসজিদে নমাজ পড়তে যেতাম। সেটা বেশ একটা রোমাঞ্চকর অভিযান মনে হত। বেলা বাড়তেই বাড়িতে বন্ধুবান্ধব সহ বিশিষ্ট অতিথিদের আগমন ঘটত। তাঁদের জন্য দুপুরে মাংস–পোলাও বা বিরিয়ানি রান্না হত। আমাদের অতিথিরা অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি হিন্দু। তাঁরা পরম আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন এবং তারপর অবধারিতভাবে খানিক গানবাজনা হতই। সব মিলিয়ে আমার ইদ ধর্ম ছাপিয়েও উৎসব ও সম্প্রীতির এক নিটোল ছবি হয়েই আমার মনে ধরা দিত যা আজও সযত্নে বয়ে চলেছি।

(লেখক বিশিষ্ট গায়ক)

জনমত

করোনাকালে দ্বেষ বাড়াবেন না অনুগ্রহ করে

এবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় বঙ্গ নিয়ে রঙ্গ দেখাতে মশগুল ছিলেন যাঁরা, তাঁদের আচরণ ছিল নজরকাড়া। বাক্যবর্ষণ ছিল লাগামছাড়া। সাজসজ্জা ছিল বলিহারি! কেউ সাজঘরে কেশ–শ্মশ্রু বিন্যাসে ব্যস্ত ছিলেন নাগাড়ে দেড় বছর। যদিও সিদ্ধকাম হননি। ফল যা হওয়ার তাই হল। কেউ আবার নিজেকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ভাবতে শুরু করলেন। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, ঘাসফুল বড়জোর ১১০টি আসন পেলেও পেতে পারে। যার জন্য শেষ দফা ভোটের পরের দিন ৩০ এপ্রিল চারজন তাবড় নেতাকে ডেকে আগাম বৈঠক সেরে ফেলা হল। সরকার বসানোর শিলান্যাস করা হল যেন। ভাবটা এমন যে, ফলাফল ঘোষণার পর শুধু আনুষ্ঠানিক ফিতে কাটা হবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বাংলার মানুষ জাতপাতের রাজনীতিকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে যে উত্তেজক পাচন তৈরি করা হয়েছিল, বাংলা তা গ্রহণ করল না। চেতনার বাতিঘরের আলো যাঁদের নিভন্ত, সেই অসহিষ্ণু মহোদয়গণ এই বর্জন নীতি মেনে নিতে পারলেন না। রেগেমেগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বাংলায় একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষ আক্রান্ত বলে উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতে তৎপর হলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন এই আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাম–গঞ্জ, শহর–নগর পুড়ে ছাই হলে দেবালয়গুলিও রেহাই পাবে না।

বাংলা নিয়ে হম্বিতম্বির অন্ত ছিল না। ছিল না বললে ভুল হবে। এখনও আছে। তা থাকুক। কিন্তু এত লম্ফঝম্প, দাপাদাপির পর বাংলা যখন অশ্বডিম্ব প্রসব করল, তখন তাঁরা সেটা হজম করতে পারলেন না। তাঁদের এই বদহজমজনিত সমস্যা এখন বাংলার জন্য ঘোর বিপদ! তাঁদের উচ্চকিত কণ্ঠ ১৯৪৬ সালে ফিরে যাচ্ছে। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং প্রসঙ্গ টেনে এনে বাংলার সাম্য–মৈত্রীকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। গাদাখানেক জিজ্ঞাসাচিহ্ন নিয়ে সদ্য ভোট বৈতরণি পার হয়েই একজন আবদার করছেন, 'কাশ্মীরের দমননীতির প্রতিফলন' তিনি বাংলায় দেখতে চান! হায়রে রাজনীতি! নিজের নাক কেটেও যদি পরের যাত্রাভঙ্গ করা যায়, তাতেই খুশি! মতিভ্রম আর কাকে বলে?

কিছু বিধ্বংসী স্মৃতি মননকে শান্ত রাখে। কিন্তু স্মৃতি শক্তিশালী হয়, মননকে তিষ্ঠোতে দেয় না। যেমনটা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল। বারাণসী–মথুরা–প্রয়াগরাজ–অযোধ্যা–গোরক্ষপুর সব হাতছাড়া! ৩০৫০টি আসনের মধ্যে মোটে ৭৬৯ খানা? কী করুণ অবস্থা! খুব মর্মান্তিক স্মৃতি! কিন্তু সেই দগদগে যন্ত্রণার ক্ষোভ–হতাশা বাংলায় কেন উগরে দেওয়া? বাংলাকে অশান্ত রাখলেই কি যন্ত্রণা উপশম হবে?

ভোটেশ্বরবাবার উৎসবে মহামারির সংকট উপেক্ষা করে, স্বাস্থ্যবিধিকে তুড়ি মেরে লাগাতার দৌড়ঝাঁপ শেষে ক্লান্তি তো আসবেই। তাই বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্রামের নাম অবস্থান–বিক্ষোভ কেন? করোনায় কাহিল দেশ। দিশেহারা দেশবাসীর জন্য কিছু করার এটাই তো সময়। একটা গোটা জাতি যখন করোনায় জর্জর, তখন এই তো সুযোগ দেশপ্রেম দেখানোর! করোনার কালবেলায় জাত–জাত করে দ্বেষ বাড়িয়ে কি লাভ?

তাপসী দে
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি যেন চ্যালেঞ্জ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবরূপে স্বঘোষিত মনুষ্যকুল তাদের বুদ্ধিবলে কী না করেছে। চাঁদের মাটিতে পা রাখা থেকে শুরু করে প্রকৃতিকে শৃঙ্খল পরিয়ে করে চলেছে কত কর্মকাণ্ড। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কখনও তাক লাগিয়ে দিচ্ছে, কখনও মাটির নীচে মস্ত সুড়ঙ্গের ভিতর করছে ইলেক্ট্রন ইত্যাদির ভর নিয়ে গবেষণা। কখনও আপন গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে আবিষ্কার করে চলেছে রকমারি সমরাস্ত্র, যা প্রয়োগে অন্য গোষ্ঠীকে করতে চায় নতজানু।

এই দাম্ভিক মনুষ্যকুল আজ প্রকৃতিরই এক অতিক্ষুদ্র জীব, যাকে খালি চোখে দেখা যায় না, তার ভয়ংকরতায় নাজেহাল। জীবটিকে চিন দেশ বেশ রংচংয়ে গালভরা নামকরণ করেছে কোভিড–১৯। ব্যাস এটুকুই। দেড় বছর পরেও নামকরণ ব্যতীত আর তেমন কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি ভাইরাসটি সম্পর্কে। শুধু হাত ধুয়ে, নাক–মুখ ঢেকে ঘরে লুকিয়ে থেকে এই জীবটির থেকে বাঁচার চেষ্টা চলছে আর মাঝে মাঝে আস্ফালন চলছে – একদিন কোভিডকে জয় করবই। কিছু রসিকজনের মুখে শোনা যাচ্ছে, এ তো ভগবানের মার, কে বাঁচাবে। কেউ বলছেন, এ যে কলিযুগে ভগবান বিষ্ণুর কল্কি অবতার, পাপস্খলন করতে এসেছেন।

একদিন হয়তো কোভিড–১৯ স্বেচ্ছায় বিদায় নেবে। ১০, ২০ বা ৫০ বছর ধরে মানুষ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কোভিড সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে। তবে স্বঘোষিত শ্রেষ্ঠ জীবের তকমাটা মনুষ্যকুলকে হারাতে হবে, এই যা।

কমলেশ সি সরকার
পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

• • •

দুয়ারে টিকা

ভোটপর্ব মিটে যাওয়া এবং সবকিছু নতুনভাবে শুরু করার জন্য অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, প্রবীণ নাগরিকদের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং তাঁদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে দুয়ারে টিকা প্রকল্প যদি চালু হয় তাহলে হয়তো রাজ্যের প্রতিটি বয়স্ক নাগরিক নিশ্চিন্তে ঘরে বসেই টিকাকরণের আওতায় সুরক্ষিতভাবে টিকা পাবেন।

দিব্যেন্দু মোহন্ত, বলিপাড়া, তালমা।